

প্রথম অধ্যায়

প্রাত্যহিক জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি



এই অধ্যায় শেষে আমরা—

১. ব্যক্তিজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব;
২. কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারব;
৩. কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
৪. সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারব—

পাঠ ১: ব্যক্তিজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

পৃথিবীতে কত নতুন নতুন প্রযুক্তির জন্ম হচ্ছে, আমরা হয়তো তার সবগুলোর কথা জানতেও পারি না। তাই সেগুলো হয়তো আমাদের জীবনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এমন একটি প্রযুক্তি যেটি আমাদের সবার জীবনেই কোনো না কোনোভাবে প্রভাব ফেলেছে। পৃথিবীতে মনে হয় একজন মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে কোনো না কোনোভাবে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেনি কিংবা তার জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কোনো না কোনো পরিবর্তন আনেনি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শুধু যে রাষ্ট্রীয় বড় বড় বিষয়ে কিংবা আন্তর্জাতিক জগতে ব্যবহৃত হয় তা নয়— একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনেও সেটি ব্যবহৃত হয়। তুমি যদি চোখ মেলে চারদিকে তাকাও তুমি দেখবে তোমার চারপাশে তোমার পরিচিত মানুষেরা, তোমার আত্মীয়স্বজন, তোমার স্কুলের শিক্ষকরা, তোমার ক্লাসের বন্ধুবান্ধবরা এবং তুমি কোনো না কোনোভাবে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেছ। এই যে তুমি এই মুহূর্তে এই লেখাটি পড়ছ সেটি কেউ একজন লিখেছে—তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেগুলো ছাপা হয়েছে, তোমার সামনে আনা হয়েছে এবং তুমি এখন পড়তে পারছ। এরকম কত উদাহরণ দেয়া যাবে— তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।



আমাদের চারপাশের যে কেউ এখন ইচ্ছে করলে অন্য একজনের সাথে মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে



টেলিভিশন এখন বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম

একজন মানুষের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কী কী ব্যবহার হতে পারে তার একটা তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করলে সেটা মনে হয় কোনোদিন শেষ করা যাবে না। কিন্তু একটু চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? অন্ততপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা চেষ্টা করে দেখা যাক।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ: তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রথম উদাহরণ হতে পারে ব্যক্তিগত যোগাযোগ। আমাদের

চারপাশের প্রায় সবার কাছেই এখন মোবাইল টেলিফোন রয়েছে, যে কেউ এখন ইচ্ছে করলে অন্য একজনের সাথে মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারে। আমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছি যে,

কোনো মানুষের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে পারার কারণে আমাদের জীবনের মান এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে, অনেক কম পরিশ্রমে আমরা এখন অনেক কিছু করতে পারি যেটা আগে কল্পনাও করতে পারতাম না।

বিনোদন: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিয়ে আমরা যে শুধু কাজ করতে পারি তা নয়— এটা এখন বিনোদনেরও চমৎকার মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে গান শোনার জন্যে মানুষকে আলাদাভাবে কোনো একটা যন্ত্র কিনতে হতো— এখন মোবাইল টেলিফোনেই সে গান শুনতে পারে। একটা সময় ক্যামেরা ছিল শুধু ধনীদেব ব্যবহারের বিষয়— এখন সাধারণ স্মার্ট ফোন দিয়েই যেকোনো মানুষ ছবি তুলতে পারে, ভিডিও করতে পারে। মোবাইল টেলিফোন ধীরে ধীরে বুদ্ধিমান একটা যন্ত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করা যায়— ঠিক সেরকম কম্পিউটারও ছোট হতে শুরু করেছে। ডেস্কটপ থেকে ল্যাপটপ, ল্যাপটপ থেকে নোটবুক, নোটবুক থেকে স্মার্ট ফোন অর্থাৎ আমাদের হাতে এমন একটা যন্ত্র চলে আসছে যেটা দিয়ে আমরা অসংখ্য কাজ করতে পারব।



জিপিএস পৃথিবীর যেকোনো জায়গার অবস্থান বের করে ফেলতে পারে

জিপিএস: গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাওয়ার প্রথম শর্তই হচ্ছে আমাদের পথঘাট চিনতে হবে। কেউ যদি পথঘাট চিনতে না পারে তাহলে সে কেমন করে গন্তব্যে পৌঁছবে। অথচ মজার ব্যাপার হলো কোথাও যেতে হলে এখন কাউকে পথঘাট চিনতে হয় না। পৃথিবীটাকে ঘিরে অনেক উপগ্রহ ঘুরছে তারা পৃথিবীতে সংকেত পাঠায়, সেই সংকেতকে বিশ্লেষণ করে যেকোনো মানুষ বুঝে ফেলতে পারে সে কোথায় আছে! তার সাথে একটা জায়গার ম্যাপকে জুড়ে দিতে পারলেই একজন মানুষ যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারবে। আজকাল নতুন সব গাড়িতেই জিপিএস লাগিয়ে দেয়া হয়। কোথায় যেতে হবে সেটি জিপিএস—এ ঢুকিয়ে দিলে জিপিএস গাড়ির ড্রাইভারকে সঠিক পথ বাতলে দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারবে। ১২ই মে ২০১৮ বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ নামের এই মহাকাশ যানটি যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। নিজস্ব স্যাটেলাইটের অধিকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীর ৫৭ তম দেশ।

দলগত কাজ

মনে করো তুমি ঠিক করেছ কোনো ধরনের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার না করে তোমার দিন কাটাবে। সারা দিনে কোন কাজগুলো তুমি করতে পারবে না তার একটা তালিকা করো



নতুন শিখলাম : ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, নোটবুক, স্মার্ট ফোন, জিপিএস, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১।

পাঠ ২: ব্যক্তিজীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতি মুহূর্তে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করি। এ প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে অনেক সময় বিষয়টা আমরা লক্ষ পর্যন্ত করি না! এটির ব্যবহার কত ব্যাপক সেটা বোঝার জন্যে আমরা কাল্পনিক একজন মানুষের একটা দিনের কথা চিন্তা করি— ধরা যাক তার নাম সাগর।

সাগরের ঘুম ভাঙল এলার্মের শব্দে, সে তার মোবাইল টেলিফোনে ভোর ছয়টার এলার্ম দিয়ে রেখেছিল। ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমেই তার মনে পড়ল আজ ছুটির দিন, তাকে কাজে যেতে হবে না! সাথে সাথে তার মনটা ভালো হয়ে গেল। এলার্মটা বন্ধ করার সময় লক্ষ করল সেখানে ডেস্ক ক্যালেন্ডার তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে আজ তার বন্ধুর জন্মদিন, বিকেলে তার বাসায় জন্মদিনের উৎসব।



কম্পিউটার ব্যবহার করে গান শোনা যায়



ই-বুক রিডার ব্যবহার করে বই পড়া যায়

হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা করতে করতে সে টেলিভিশনে ভোরের খবরটা শুনতে নেয়। ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে শুনতে তার মনটা ভালো হয়ে যায়। আবার বজ্রোপসাগরে একটা নিম্নচাপ হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে সাগরের খানিকটা দুশ্চিন্তাও হলো।

নাশতা করে সাগর তার ল্যাপটপটি নিয়ে বসে, প্রথমেই সে তার ই-মেইলগুলো দেখে, তার প্রবাসী ভাই তার পরিবারের একটা ছবি পাঠিয়েছে। ছবিটা ভারি সুন্দর— সাগরের মনে হলো সেটা ঘরে টানিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। তাই সে প্রিন্টারে সেটা প্রিন্ট করে নিল।

ই-মেইলে চিঠিপত্রের উত্তর দিয়ে সে তার প্রিয় কয়েকটা গান বাজাতে শুরু করে দেয়। গান শুনতে শুনতে সে তার ই-বুক রিডারে একটা বই পড়তে শুরু করে। প্রিয় বই পড়তে পড়তে কীভাবে যে সময় কেটে গেল সাগর বুঝতেই পারল না!

যখন বইটা শেষ হয়েছে তখন একটু বেলা হয়ে গেছে। হঠাৎ করে তার মনে হলো বাসায় খাবার নেই। বাজার করা হয়নি। সাগরের হঠাৎ মনে হলো ইন্টারনেটে খাবারের অর্ডার দেয়া যায়— তারা বাসায় এসে খাবার পৌঁছে দেয়। সাগর তখনই ইন্টারনেটে তার প্রিয় খাবার বিক্রেতাদের অর্ডার দিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসিখুশি এক তরুণ তার বাসায় বিরিয়ানি নিয়ে আসে। সাগর বলল, “আমার বাসাটা খুঁজে পেতে তোমার কি কোনো সমস্যা হয়েছে?” তরুণটি বলল, “একটুও অসুবিধে হয়নি— আমি জিপিএসে আপনার ঠিকানাটা দিয়ে দিয়েছি, সেটা আমাকে কোন পথে আসতে হবে বলে দিয়েছে।”



কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ঘরে বসে সারা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করা যায়

সাগর খেতে খেতে আবার তার কম্পিউটারে পৃথিবীর খবরাখবর নেয়। নিউট্রিনো (Neutrino) নিয়ে বিজ্ঞানের একটা চমকপ্রদ খবর বের হয়েছে। নিউট্রিনো কী— সাগর সেটা জানে না তাই সে উইকিপিডিয়াতে নিউট্রিনো সম্পর্কে চমৎকার একটা লেখা পড়ে নিল। শুধু তাই নয়, নতুন একটা সিনেমা খুব নাম করেছে— সিনেমাটা দেখলে মন্দ হয় না। সাগর তখনই সিনেমাটা ডাউনলোড করতে শুরু করে দেয়, রাতে সে সেটা দেখবে।

বিকেলে বন্ধুর বাসায় জন্মদিনের উৎসবে যাবে—

তাকে কিছু একটা উপহার দেয়া দরকার। কল্লুটি বই পড়তে খুব ভালোবাসে তাই সাগর ইন্টারনেটে একটা বই অর্ডার দিয়ে দেয়, বন্ধুর বাসায় বইটা পৌঁছে যাবে। সে নিজের জন্যও একটা বই অর্ডার দিল। ব্যাংকে যথেষ্ট টাকা আছে কি না জানা দরকার। সাগর তখন তার ব্যাংকে খোঁজ নিল, সেভিংস থেকে কিছু টাকা তার চেকিং একাউন্টে নিয়ে আসে।

দলগত কাজ

এখানে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর কী কী কাজ করা সম্ভব তার একটি তালিকা তৈরি করো।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তার মোবাইল বেজে উঠে— বাড়ি থেকে তার মা ফোন করেছেন। সাগর জিজ্ঞেস করল, “মা ভালো আছ তোমরা?” মা বললেন, “হ্যাঁ ভালোই আছি, তবে তোরা বাবার চশমাটা মনে হয় বদলাতে হবে, স্পর্শ নাকি দেখতে পায় না।” সাগর বলল, “তুমি চিন্তা করো না মা, আমি সামনের সপ্তাহে চলে আসব, বাবাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।”

মায়ের সাথে কথা শেষ করে সাগর মোবাইল টেলিফোনে তখনই ট্রেনের টিকেট বুক করে দেয়। ভালো চোখের ডাক্তারের খোঁজ নেবার জন্য সে রাতে ই-চিকিৎসা কেন্দ্রে খোঁজ নেবে।

বন্ধুর বাসায় জন্মদিনের উৎসবে সবাই মিলে খুব আনন্দ করল, ছোট বাচ্চারা ঘরের এক কোণায় হইচই করে কম্পিউটার গেম খেলছে। রাতে খাবার খেয়ে সাগর বাসায় ফিরে আসে। পরদিন কাজে যেতে হবে তাই সে সকাল সকাল শূয়ে পড়ে। বিছানায় শূয়ে শূয়ে সে শেষ খবরটা শুনতে নেয়। উপগ্রহ থেকে ছবি তুলে দেখা গেছে ঘূর্ণিঝড়টা ঘুরে অন্যদিকে চলে গেছে। দেশের কোনো বিপদ নেই। খবরটা শুনে সাগরের মনটা ভালো হয়ে যায়— নিশ্চিন্ত মন নিয়ে সে ঘুমাতে গেল।

তোমরা কি লক্ষ করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিয়ে সে সাগর সারাটা দিন কত কাজ করেছে? অল্প কিছুদিন আগেও কেউ কি এটা কল্পনা করতে পারতো?



নতুন শিখলাম : ই-বুক রিডার, উইকিপিডিয়া, ডাউনলোড, ই-চিকিৎসা কেন্দ্র, নিউট্রিনো।

পাঠ ৩: কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তোমরা সবাই জানো শিক্ষার্থীরা স্কুল শেষ করে কলেজে যায়, কলেজ শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যায়। আমাদের দেশে অনেকগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। উচ্চমাধ্যমিক পড়া শেষ করে শিক্ষার্থীদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আলাদা করে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। এক সময় এই ভর্তি পরীক্ষার কাজটি ছিল খুব কঠিন, শিক্ষার্থীদের অনেক দূর থেকে দেশের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাসে, ট্রেনে, জাহাজে যেতে হতো, লাইনে দাঁড়িয়ে ভর্তির ফর্ম আনতে হতো। সেই ফর্ম পূরণ করে আবার তাদের সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হতো, ক্যাশ টাকা জমা দিতে হতো, ফর্ম জমা দিয়ে পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিতে হতো, সেই প্রবেশপত্র নিয়ে পরীক্ষা দিতে হতো। পরীক্ষার খাতা দেখা শেষ হলে ফলাফল প্রকাশিত হতো—খবরের কাগজে সেই ফলাফল দেখে যারা সুযোগ পেত তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো।

২০০৯ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক করল তারা পুরো প্রক্রিয়াটি তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে শেষ করবে— এবং এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোথাও কোনো কাগজ ব্যবহার হবে না! ভর্তির রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোনো প্রার্থীকে তার ঘর থেকে বের হতে হবে না। ২০০৯ থেকে দেশের প্রায় সব স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সময় এভাবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এখন সবাই নিজের ঘরে বসে শুধু স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করার কারণে বিশাল একটি কর্মঘণ্টা হয়ে গেল পানির মতো সহজ!



স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে এখন প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা যায়

দলগত কাজ

তোমাদের স্কুলের অফিসকে কাগজবিহীন অফিসে রূপান্তর করতে হলে কী কী কাজ করতে হবে গুছিয়ে লেখো।

কাগজ ব্যবহার না করে অফিসের কাজকর্ম করার এই বিষয়টি আমাদের দেশে মাত্র শুরু হলেও ধারণাটি কিছু নতুন নয়। ১৯৭৫ সালে বিজনেস উইক নামের একটা ম্যাগাজিনে প্রথমবার এটি সম্পর্কে একটি

প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল কিন্তু তখন সেটি ছিল অনেকটা কল্পবিজ্ঞানের মতো, কারণ এটি বাস্তবে রূপ দিতে হলে অফিসের সবার কাছে একটা কম্পিউটার থাকতে হবে— যেটি তখন কেউ চিন্তাও করতে পারত না।



বাংলাদেশের প্রযুক্তিবিদদের তৈরি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করে ভোট দেয়া ও ভোট গণনার কাজ করা যায়

এখন সেটি বাস্তবসম্মত হয়েছে। এখন অনেক অফিস পুরোপুরি কাগজবিহীন অফিসে পাল্টে গেছে। অফিসে কাগজে কিছু লিখতে হয় না— কম্পিউটারে লিখে একজন আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কম্পিউটারগুলো নেটওয়ার্ক দিয়ে একটির সাথে আরেকটি যুক্ত হয়ে আছে কাজেই চোখের পলকে সব কাজকর্ম হয়ে যায়। কাগজে কিছু লেখা হয় না বলে কাগজের খরচ বেঁচে যায়। কাগজ তৈরি হয় গাছ থেকে তাই যখন কাগজ বেঁচে যায় তখন গাছও বেঁচে যায়, পরিবেশটা থাকে অনেক সুন্দর। কাগজে লেখার কালি বা টোনার ব্যবহার হয় না বলে রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে পরিবেশও দূষণ হয় না।

যত দিন যাচ্ছে কম্পিউটারের মনিটরগুলো হচ্ছে বড়, তাই সেখানে কিছু একটা পড়ার কাজটিও হয়েছে অনেক সহজ। দেখা গেছে নতুন প্রজন্মের তরুণরা আজকাল কাগজে না লিখে কম্পিউটারে লিখতে পছন্দ করে, কাগজে না পড়ে মনিটরে পড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এক সময় ক্যামেরায় ছবি তুলে সেগুলো প্রিন্ট করতে হতো। আজকাল ক্যা মরায় তোলা ছবি প্রিন্ট না করেই মানুষ সরাসরি কম্পিউটারে বা মোবাইলের স্ক্রিনে দেখে নেয়।

আমাদের দেশের বেসরকারি ব্যাংকগুলোও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কাগজবিহীন অফিসে রূপান্তরিত হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং গ্রাহকদের সাথে ব্যাংকের যোগাযোগ থেকে শুরু করে গ্রাহকের সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা যাচ্ছে। ব্যাংকিং কার্যক্রমের এই পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি হল অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেমের ব্যাপক ব্যবহার। এই সিস্টেমে গ্রাহকগণ তাদের অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে, তহবিল স্থানান্তর করতে এবং বাহ্যিক কাগজপত্রের প্রয়োজন ছাড়াই যে কোন বিল পরিশোধ করতে পারে। এই সিস্টেমে মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। অ্যাপের সাহায্যে গ্রাহকগণ তাদের স্মার্টফোন থেকেও সরাসরি লেনদেন করতে, ব্যালেন্স চেক করতে, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করতে এবং অন্যান্য সেবা গ্রহণ করতে পারে।

দলগত কাজ

তোমাদের ক্লাসে দুটি দল তৈরি করে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করলে কী সুবিধা এবং কী অসুবিধা সেটি নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করো।



পাঠ ৪ : কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

কাগজ ব্যবহার না করে অফিসের কাজকর্ম চালানো যদি তথ্য প্রযুক্তির একটা ধাপ হয় তাহলে তার পরের ধাপটি কী হতে পারে?

তোমরা কেউ কেউ নিশ্চয়ই অনুমান করে ফেলেছ— সেটি হবে অফিসে না গিয়েই অফিস করা। আমরা সবকিছুই যদি কম্পিউটার দিয়ে করি, আর সব কম্পিউটারই যদি নেটওয়ার্ক দিয়ে একটার সাথে আরেকটা জুড়ে দেয়া থাকে তাহলে আমি সেই কম্পিউটারটা অফিসে বসে ব্যবহার করছি নাকি বাসায় বসে ব্যবহার করছি তাতে কী আসে যায়? আসলেই কিছু আসে যায় না— আর সেটাই হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের অফিসের ধারণা। ১৯৮৩ সালে প্রথম এটা নিয়ে আলোচনা হয় আর ১৯৯৪ সালে প্রথম এ ধরনের একটা অফিস শুরু হয়। যারা কাজ করছে তারা সশরীরে কেউ অফিসে নেই কিন্তু অফিসের কাজ চলছে— এরকম অফিসের নাম হচ্ছে ভার্চুয়াল অফিস।



একটি বিশাল কল সেন্টার

সব অফিসকেই যে ভার্চুয়াল অফিস বানানো যাবে তা নয়— কিন্তু যোগুলো বানানো যাবে— সেখানে অনেক লাভ। প্রথমত তোমাকে অফিসের জন্যে বড় বিল্ডিং করতে হবে না। রাস্তাঘাটের ট্রাফিক জ্যামের সাথে যুদ্ধ করে কাউকে অফিসে আসতে হবে না। বাসায় বসে কাজ করতে পারবে বলে অফিসের কাজের পাশাপাশি বাসার কাজকর্মও করতে পারবে। অফিসে গেলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করতে হবে— কিন্তু বাসায় বসে কাজ করলে অফিসের সময়ের বাইরেও অনেক কাজ করা সম্ভব! কাজেই ভার্চুয়াল অফিসের কাজকর্ম সাধারণ অফিস থেকেও বেশি হতে পারে।

ভার্চুয়াল অফিসের সবচেয়ে চমকপ্রদ সুবিধের কথাটা এখনো বলা হয়নি। সাধারণ অফিসে যারা কাজ করে তাদেরকে অফিসের কাছাকাছি থাকতে হয়। ভার্চুয়াল অফিসে যেহেতু কাউকে সশরীরে থাকতে হয় না তাই তারা যেখানে ইচ্ছে সেখানে থাকতে পারে। কাজেই এক অফিসের একেকজন হয়তো একেক শহরে থাকে। সত্যি কথা বলতে কী অনেক অফিসেই কিন্তু এভাবে কাজ করে। পৃথিবীটা যেহেতু তার অক্ষের উপর ঘুরে তাই এক পৃষ্ঠে যখন দিন তখন পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠে রাত। দিনের বেলা হয়তো একদল অফিস করে ঘুমাতে গেল, তখন পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠের অন্য দল ঘুম থেকে উঠে কাজ শুরু করে দিলো। যার অর্থ অফিসটা চব্বিশ ঘণ্টা চলছে।



আজকাল কল সেন্টার বলে প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়— আমাদের দেশেও অনেক কল সেন্টার আছে। নানা ধরনের কল সেন্টার নানা ধরনের কাজ করে। কোন কোন কল সেন্টারের কর্মীরা নির্দিষ্ট কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে গ্রাহক বা সেবাগ্রহীতার নানা জিজ্ঞাসার জবাব দেয় এবং সেবা প্রদান করে। ধরা যাক কেউ একটা কম্পিউটার কিনেছে— সেই কম্পিউটারটা নিয়ে তার একটা সমস্যা হয়েছে তাই সে কম্পিউটারের কোম্পানীতে ফোন করল। সে হয়তো ভাবছে তার ফোনের উত্তর দিচ্ছে আশপাশের কোনো একজন মানুষ— আসলে সেই ফোনটি হয়তো চলে এসেছে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে কোনো একটি কল সেন্টারে। সেখানে যারা আছে তারা এই প্রশ্নের উত্তরটা খুব ভালো করে জানে কারণ তাদের কাছে আগে হয়তো আরো অনেক মানুষ এই প্রশ্নটি করেছে। তাই খুব সহজেই কল সেন্টার থেকে উত্তর দিয়ে সেই মানুষটিকে খুশি করে দিলো।

দলগত কাজ

তোমাদের স্কুলে একটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুম তৈরি করতে হলে কী কী করতে হবে সেটি লেখো।

আমাদের দেশের অনেক তরুণ-তরুণী আজকাল অফিসে গিয়ে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কাজ করার চেয়ে তার নিজের ঘরে বসে স্বাধীনভাবে যখন ইচ্ছে কাজ

করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তাদের কাজের ক্ষেত্রটি তখন আর নিজের শহর কিংবা নিজের দেশের মাঝে আটকে থাকে না, তখন সেটা হয়ে যায় সারা পৃথিবী। তারা শুধু যে কাজ করে আনন্দ পায় তা নয়— অনেক টাকাও উপার্জন করতে পারে। এত কিছুর জন্য তার দরকার শুধু একটা কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের সংযোগ। অবশ্যই তার সাথে আরো একটা জিনিস দরকার— সেটা হচ্ছে দক্ষতা!

কাজেই তোমরা বুঝতেই পারছ নতুন পৃথিবীতে একসাথে মিলে অনেকে কাজ করতে হলে তাদেরকে আর এক জায়গায় বসে কাজ করতে হয় না। এই যে বইটা তুমি পড়ছ— তুমি কি জান যারা এই বইটা লিখেছে, সাজিয়েছে তারা কেউ কখনো একসাথে বসেনি— সবাই নিজের ঘরে বসে কাজ করেছে।



নতুন শিখলাম : ভার্চুয়াল অফিস, কল সেন্টার, কাগজবিহীন অফিস।

পাঠ ৫ : কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তোমরা নিশ্চয়ই জানো বাংলাদেশ এখন বিশাল বিশাল জাহাজ তৈরি করে পৃথিবীর বড় বড় দেশে রপ্তানি করে। আমাদের এত সুন্দর দেশটির ভেতর দিয়ে বিশাল বিশাল নদী গিয়েছে— এই দেশের মানুষ নদী-বিল-সমুদ্রে বড় হয়েছে— কাজেই তারা যে চমৎকার নৌকা আর জাহাজ বানাতে পারবে তাতে অবাক হবার কী আছে?



ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট দিয়ে আজকাল বিপজ্জনক
যান্ত্রিক কাজ করা হয়

তোমরা শূন্যে খুশি হবে— এ ধরনের বিপজ্জনক কাজগুলো আসলেই আস্তে আস্তে মানুষ নিজে না করে রোবটদের দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছে। মানুষেরা কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায়— একঘেয়ে কাজ হলে কাজ করতে ইচ্ছেও করে না। রোবটরা ক্লান্ত হয় না। একঘেয়ে কাজটি নিয়ে তারা কখনো অভিযোগও করে না। তাই পৃথিবীর বড় বড় কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে আর মানুষ নেই। কাজ করে রোবটরা। মানুষেরা বড়জোর দেখে কাজটা ঠিক মতো হচ্ছে কি না।

বড় বড় জাহাজ বানাতে হলে বিশাল বিশাল ধাতব টুকরোকে নির্দিষ্ট আকারে কেটে তারপর ওয়েল্ডিং করতে হয়। তোমরা নিশ্চয়ই পথে-ঘাটে দোকানে ওয়েল্ডিং করতে দেখেছ। সেখান থেকে যে তীব্র আলো বের হয় কেউ যদি সোজাসুজি সেদিকে তাকায় তাহলে তার চোখ পাকাপাকিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। যারা ওয়েল্ডিং করে তাদের বিশেষ চশমা পরে কাজ করতে হয়। সেখানে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়, ধাতব টুকরো ছিটকে ছিটকে পড়ে। কাজটি দেখেই মনে হয় এটি বেশ বিপজ্জনক কাজ। এই বিপজ্জনক কাজটি যদি মানুষকে করতে না হতো, কোনো একটা রোবট করত — তাহলে কেমন হতো?



ড্রাইভার ছাড়াই এই গাড়ি চালানো যায়

একঘেয়ে বিপজ্জনক কাজগুলো মানুষ থেকে রোবটেরা অনেক ভালোভাবে করতে পারে। কাজেই যত দিন যাচ্ছে ততই এই কাজগুলো মানুষের বদলে মেশিনেরা করছে— তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

আমাদের পথে-ঘাটে প্রতিদিন কত একসিডেন্ট হয়— মোটামুটি অনুমান করা যায় আর কয়েক দশক পর একসিডেন্ট কমে আসবে — কারণ তখন গাড়ি আর মানুষেরা চালাবে না। গাড়ি চালাবে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যন্ত্র। গাড়ির বেলায় সেটা শুরু হতে একটু দেরি হচ্ছে— আকাশ পথে সেটা কিন্তু এর মাঝে শুরু হয়ে গেছে। বিশাল বিশাল প্লেন যখন আকাশে উড়ে তখন পাইলটদের কিছু করতে হয় না— কম্পিউটারই সবকিছু করে। যুদ্ধবিমানে আজকাল পাইলট থাকেই না, পাইলটবিহীন ড্রোনগুলো যে প্রতিদিন ছবি তুলছে এবং ভিডিও করছে তা আমরা সবাই জানি।

আমাদের কাজের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি কেমন করে ব্যবহার হয় তার তালিকা করতে গেলে সেটি শেষ হবে বলে মনে হয় না। দাপ্তরিক চিঠিপত্র যোগাযোগের কথা তো আগেই বলা হয়েছে—অফিসের মিটিংগুলোও আজকাল অন্যভাবে হয়। বিভিন্ন অফিসের বিভিন্ন মানুষ আলাদাভাবে বসে একসাথে কনফারেন্স করে। আমাদের দেশেই অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ই—ক্লাসরুম তৈরি হচ্ছে, একজন শিক্ষক তার ক্লাসরুমে পড়াবেন, সারা দেশের অসংখ্য মানুষ তার কাছে পড়বে। অফিস ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। আগে অফিসে বড় বড় ফাইল এক রুম থেকে অন্য রুমে যেতে দিন পার হয়ে যেত—নতুন ইলেকট্রনিক ফাইল চোখের পলকে এক অফিস থেকে অন্য অফিস চলে যায়।



একটি ক্যামেরা ড্রোন

দলগত কাজ

রোবট দিয়ে করাতে চাও এমন কতগুলো কাজের তালিকা তৈরি করো।

অফিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হয় টাকাপয়সা বা একাউন্টিং সংক্রান্ত, তথ্য প্রযুক্তির কারণে সেই কাজগুলো এখন সহজ হয়েছে—বড় বড় লেজার

খাতায় মাথা গুঁজে কিছু লিখতে হয় না, কম্পিউটার মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু করে ফেলে।

মানুষের কাজের জায়গায় সব সময়ই কাউকে না কাউকে কিছু একটা বলতে হয়, বোঝাতে হয়, আলোচনা করতে হয়। এসব কাজের জন্য এত চমৎকার ব্যবস্থা বের হয়েছে, এত সুন্দর করে সবকিছু করে ফেলা যায় যে মাঝে মাঝে মনে হয় আগে এই কাজগুলো কেমন করে করা হতো?



নতুন শিখলাম: রোবট, পাইলটবিহীন ড্রোন, ই—ক্লাসরুম

পাঠ ৬ : সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে আইসিটি: আমরা সবাই সমাজে থাকি। তুমি, তোমার বন্ধুরা হয়তো কোনো গ্রাম বা শহরে থাকো। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো স্কুলের হোস্টেলে থাকো। বাবা, মা, দাদা, দাদি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব – সবাইকে নিয়ে আমাদের সমাজ। এখানে কেউ চাকরি করে, কেউ ব্যবসা করে, কেউ শিক্ষার্থী, কেউবা বাড়িতে গৃহস্থালীর কাজ করে। পারস্পরিক সম্পর্ক আর দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে একটি সমাজ এগিয়ে চলে। সমাজের নানা প্রয়োজনে আমরা নানান ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করি। এক সময় যোগাযোগ বলতে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হতো খবর দিতে। পরে দেখা গেল ঢোল বাজিয়েও খবর দেয়া যায়। মানুষ যখন লিখতে শিখল তখন সে চিঠি লিখে মনের ভাব আর খবর পাঠাতে শুরু করল। গড়ে উঠল ডাক বিভাগ, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চিঠি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা। টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের আবিষ্কার এই ব্যাপারগুলোকে আরও সহজ করে ফেললো।

আর এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সামাজিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারগুলোকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। আইসিটির প্রচলিত হাতিয়ারগুলোর পাশাপাশি এখন ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগের অনেক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে যা এই সামাজিক কর্মকাণ্ড সহজভাবে করার সুযোগ করে দিচ্ছে।

আইসিটি ব্যবহার করে কীভাবে সামাজিক সম্পর্কগুলো বিকশিত হচ্ছে তার কয়েকটি উদাহরণ আমরা প্রথমে দেখে নেই:

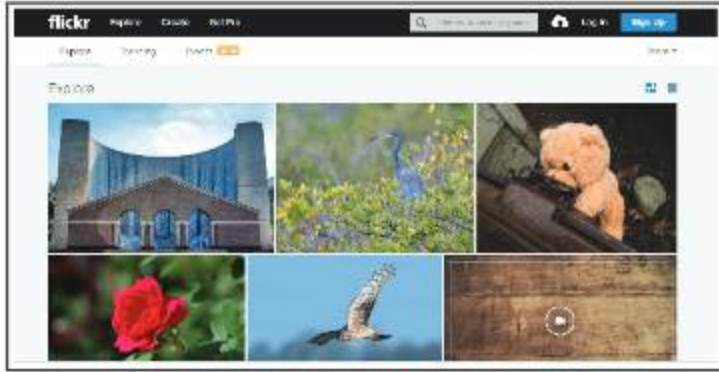


ক. অনুষ্ঠানাদিতে আমন্ত্রণ: এক সময় কেবল কাগজের আমন্ত্রণপত্র এবং টেলিফোনেই কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য দাওয়াত দেওয়া যেত। এখন এগুলোর পাশাপাশি ই-মেইল বা মুঠোফোনের খুদেবার্তায় (এসএমএস) দাওয়াত দেওয়া যায়। ই-মেইল বা খুদেবার্তার সুবিধা হলো তা যার কাছে পাঠানো হচ্ছে ঠিক সে সময়েই তাকে ফোন ব্যবহার করতে হয় না, তার সুবিধামতো সময়ে সে দেখে নিতে পারে।

ই-কার্ড অনেক চমকপ্রদ হতে পারে, কাগজ কালি ব্যবহার হয় না বলে অনেক পরিবেশবান্ধব।

খ. বিশেষ দিবসসমূহে শুভেচ্ছা বার্তা: তুমি তোমার বন্ধুদের জন্মদিন, ঈদ বা পূজার সময় শুভেচ্ছা-বার্তা পাঠাতে চাও। যেসব বন্ধু তোমার আশপাশে থাকে তাদের কাছে তুমি তোমার হাতে বানানো কার্ড দিতে পারো। কিন্তু যারা ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন দূরত্বে থাকে? তাদের কাছেও কার্ড পাঠানো যায় ডাকযোগে তবে এখন সবাই পাঠায় ই-কার্ড। ই-কার্ড দুইভাবে পাঠানো যায়। একটি হলো তুমি নিজে কম্পিউটারে

ই-কার্ড তৈরি করে সেটি ই-মেইলে পাঠাতে পারো। আবার ইন্টারনেটে অনেক ই-কার্ডের সাইট আছে যেখান থেকে তোমার পছন্দের ই-কার্ডটি প্রিয়জনের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারো। এজন্য সাধারণত কোনো টাকাপয়সা খরচ হয় না। তোমার বন্ধু বা প্রিয়জন তাদের ইন্টারনেটের মাধ্যমে তোমার কার্ড পেয়ে যায়। আবার শুভেচ্ছা জানানোতে মুঠোফোনের খুদেবার্তা এখন অনেক জনপ্রিয়। এর মাধ্যমে খুব সহজে প্রিয়জনের কাছে শুভেচ্ছা, উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা পৌঁছে দেওয়া যায়। এখন বিভিন্ন এফএম রেডিওতে পছন্দের গান বাজিয়েও প্রিয় বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানানোর রেওয়াজ চালু হয়েছে। এসএমএস-এর মাধ্যমে শ্রবণ প্রতিবন্ধীরাও ভাববিনিময় করতে পারে। একইভাবে কথাবলা সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরাও কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারে। এসবের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধনগুলো দৃঢ় হয়।



ছবি সংরক্ষণ আর বিতরণের জন্য চমৎকার ওয়েবসাইট রয়েছে



ইউটিউবে ভিডিও দেখা যায়

রয়েছে যেখানে তুমি ছবি আপলোড করে তা অন্যদের জানাতে পারবে। এরকম সাইটগুলোর মধ্যে গুগল ফটোস (photos.google.com) এবং ইয়াহুর ফ্লিকার এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। কেবল ছবি নয়, ইচ্ছে করলে তুমি তোমার তোলা ভিডিও সারাবিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পারো ভিডিও শেয়ারিং সাইটের মাধ্যমে। এরকম সাইটগুলোর মধ্যে ইউটিউব (www.youtube.com) অধিক জনপ্রিয়।

দলগত কাজ

তোমাদের ক্লাসের কোনো একটি অনুষ্ঠানের জন্যে এসএমএস ব্যবহার করে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাও।



নতুন শিখলাম: খুদে বার্তা, ই-কার্ড, ভিডিও শেয়ারিং সাইট।

পাঠ ৭: সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সামাজিক যোগাযোগের সাইট: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের সামাজিক যোগাযোগকে দ্রুত, আকর্ষণীয়, এবং কার্যকরী করে তুলেছে। শুধু তাই নয়, এর বাইরেও নানানভাবে আমাদের সামাজিক ব্যাপারগুলো ইন্টারনেটে উঠে এসেছে। আগের পাঠে বলা হয়েছে তোমার বন্ধুকে কোনো কিছু জানাতে হলে খুদেবার্তা বা ই-মেইল পাঠানোর কাজটি কিন্তু তোমাকে করতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তুমি যা কিছু করছো তাই তোমার বন্ধুরা জেনে যাচ্ছে, আলাদা করে তোমার কিছুই করতে হচ্ছে না তাহলে



পৃথিবীর কোটিকোট লোক ফেসবুক ব্যবহার করে

খুবই জনপ্রিয়। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাভাষী লোক এই সাইটগুলো ব্যবহার করে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ফেসবুক। পৃথিবীর কোটি কোটি লোক এখন ফেসবুক ব্যবহারকারী। বাংলাদেশেও ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে। ফেসবুক বা অনুরূপ সাইটগুলোতে প্রত্যেক ব্যবহারকারী তার পরিচিতিমূলক একটি বিশেষায়িত ওয়েবপেইজ চালু করতে পারেন। এটিকে বলা হয় ব্যবহারকারীর প্রোফাইল। ব্যবহারকারী তার নিজের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, তার ভালোলাগা, ভালো না লাগা ইত্যাদি বিষয়গুলো তার প্রোফাইলে প্রকাশ করে। এরপর একজন তার প্রোফাইল থেকে ফেসবুকে তার বন্ধুদের খুঁজে বের করে। এখানে বন্ধু বলতে আমরা প্রচলিতভাবে যেটা বোঝাই সেটা বোঝানো হচ্ছে না, ফেসবুক অনুযায়ী একজন মানুষের সঙ্গে অন্য যত মানুষের যোগাযোগ থাকবে তারা সবাই হচ্ছে 'তার বন্ধু'। যদি তোমার বন্ধুটিরও ফেসবুকে প্রোফাইল থাকে তাহলে তুমি তাকে খুঁজে নিয়ে বন্ধু হওয়ার জন্য অনুরোধ পাঠাতে পারো। যদি সে সম্মতি দেয় তাহলে তোমরা বন্ধু হয়ে যাবে। একইভাবে অন্য কেউ যদি তোমাকে বন্ধু হওয়ার অনুরোধ করে আর তা তুমি গ্রহণ করো তাহলে তুমিও তার বন্ধু হবে। তুমি আর তোমার বন্ধুরা মিলে হবে তোমার 'নেটওয়ার্ক' বা তোমার 'সামাজিক নেটওয়ার্ক' বা সোশাল নেটওয়ার্ক (Social Network)।

এখন তোমার নেটওয়ার্ক আস্তে আস্তে বড় হতে থাকবে। তোমার প্রাইমারি স্কুলের যে বন্ধুটির সাথে তোমার দীর্ঘদিন দেখা হয় না, যে কিনা এখন হয়তো অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, তাকেও তুমি এখানে খুঁজে পেতে পারো। তুমি যখনই তোমার প্রোফাইলে কোনো তথ্য প্রকাশ করবে সঙ্গে সঙ্গে তা তোমার বন্ধুদের পেজের একটি বিশেষ জায়গায় ভেসে উঠবে। তুমি তোমার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে যা ফেসবুকে ‘স্ট্যাটাস’ নামে পরিচিত। এক্স-এ এটাকে বলা হয় পোস্ট।



এক্স-এ ছোট ছোট পোস্ট দ্রুত ছড়িয়ে দেয়া যায়

তুমি যদি কোনো ছবি প্রকাশ করো, যদি কোনো ভিডিও সবাইকে দেখাতে চাও তাহলে তা তোমার প্রোফাইলে প্রকাশ করলেই তা তোমার নেটওয়ার্কের সবাই দেখতে পাবে। শুধু তাই নয়, তোমার বন্ধুদের সবাইকে ফেসবুক মনে করিয়ে দেবে তোমার জন্মদিন কবে! সবাই তখন তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারবে। কেবল তোমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ নয়। এখন এই সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোর মাধ্যমে পণ্যের বিজ্ঞাপন, কাজের খবর এমনকি সামাজিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজও হচ্ছে।

২০১০-২০১১ সালে তিউনিসিয়া, মিশর, লিবিয়ার গণঅভ্যুত্থানে সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ সাইটের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশে ২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন ও কোটা সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সোশ্যাল মিডিয়া যেমন: ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।



দলগত কাজ

ফেসবুকের মতো একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে নতুন কী করা যায় সেটি লেখো।



নতুন শিখলাম: প্রোফাইল, সামাজিক নেটওয়ার্ক, স্ট্যাটাস।

নমুনা প্রশ্ন

১. কোন আবিষ্কারের ফলে নতুন কোথাও ভ্রমণের ক্ষেত্রে পথঘাট চিনতে সুবিধা হয়?

- ক. কম্পিউটার খ. ইন্টারনেট
গ. মোবাইল ফোন ঘ. জিপিএস

২. নিউট্রিনো সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে আমরা কোনটি ব্যবহার করব?

- ক. কম্পিউটার খ. ইন্টারনেট
গ. ল্যান্ডফোন ঘ. মোবাইল ফোন

৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে—

- i. বই পড়া যায়
ii. ব্যাংকের লেনদেন করা যায়
iii. গেম খেলা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রেবা এবার উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেখে এক রাতে বসেই সে ঢাকা ও জাহাজীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করে।

৪. রেবা ভর্তির আবেদন করতে পারে—

- i. মোবাইল ফোন ব্যবহার করে
ii. ইন্টারনেট ব্যবহার করে
iii. কম্পিউটার ব্যবহার করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫. এ ধরনের আবেদন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত সুবিধাদি হলো—

- i. সময় ও অর্থ সাশ্রয়
ii. শারীরিক শ্রম লাঘব
iii. পরিবেশ সংরক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. রেবা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভর্তির আবেদন করেছিল তার নাম কী?

- ক. মোবাইল প্রযুক্তি খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
গ. ইন্টারনেট ঘ. কম্পিউটার

৭. ৬ নম্বর প্রশ্নের যে উত্তরটি তুমি পছন্দ করেছ সে উত্তরটি পছন্দ করার কারণ যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।